বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* : ব্রাত্যজনের কথাশিল্প

মোছা. চারমিন সুলতানা*

[সারসংক্ষেপ : নিভৃতচারী কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার মর্মমূলে প্রোথিত রয়েছে বাংলার অপরূপ নিসর্গসৌন্দর্য এবং প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে যেভাবে একীভূত করে বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যকর্মে উপস্থাপন করেছেন, তা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। বাংলা অঞ্চলের বাইরের, তথা বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দিগন্ত-প্রসারিত আরণ্যপ্রকৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট জনপদের মানুষকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেছেন তাঁর অন্যতম কালজয়ী উপন্যাস *আরণ্যক*। নির্জন অরণ্যের কোলে লালিত, আমাদের চেনা-পরিচিত জীবন-পরিসর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, স্বতন্ত্র লোকায়ত জীবনাচারে অভ্যস্ত, তথাকথিত 'সভ্য' সমাজের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত জীবনচর্চাকারী, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও সরলতাপূর্ণ এক গতিশীল ব্রাত্যজীবনের ছবি অসামান্য শিল্পসুষমায় ভাষারূপ দিয়েছেন এ-উপন্যাসে। বৃহৎ-বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন বিহারের পূর্ণিয়া-ভাগলপুরের অন্তর্গত লবটুলিয়া-বইহারের আরণ্যক মানুষের জীবনযাপন নিয়ে রচিত *আরণ্যক* বিভূতিভূষণের ঔপন্যাসিক সত্তাকে দিয়েছে কালোত্তর মহিমা। এ-উপন্যাসের পট-পরিসরে অঙ্কিত ব্রাত্য ও বঞ্চিত মানুষদের জীবনকথা বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক। এ বিষয়টির ওপরই আলোকসম্পাত করা হয়েছে এ-প্রবন্ধে।]

এক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) তাঁর *আরণ্যক* উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে প্রধানত শ্রমজীবী 'গাঙ্গোতা' সম্প্রদায়ের জীবনকথা রূপায়িত করেছেন। এক কালে গঙ্গা-তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো 'গাঙ্গোতা' জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ এবং 'গঙ্গা' নাম থেকেই এ-জাতিগোষ্ঠীর নামকরণ 'গাঙ্গোতা' করা হয়।[১] 'গাঙ্গোতা' বিহারের একটি জাতিগোষ্ঠী। প্রধানত বিহারের ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও মুঙ্গের অঞ্চলে এদের বসবাস। এক তথ্যানুযায়ী ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের ভাগলপুরে ৪৯,২২৬ জন, পূর্ণিয়ায় ১২,৭০২ জন এবং মুঙ্গেরে ৮,৭৫৭ জন গাঙ্গোতা জাতিভুক্ত মানুষ বাস করতো (Risley, 1891 : 269)। *আরণ্যক* উপন্যাসে স্থান পেয়েছে ভাগলপুর অঞ্চলের ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দুর্গম অরণ্যে বসবাসকারী গাঙ্গোতা জাতিগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-বেদনা, উৎসব-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস, আচার-বিশ্বাস, রীতি-প্রথা, ধর্ম-কর্ম, অর্থনীতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রেম-বিরহ তথা জীবনযাত্রার সামগ্রিক ইতিবৃত্ত। গাঙ্গোতা ছাড়াও দোষাদ, ছত্রী, চাষা-কলোয়ার, মৈথিল ব্রাহ্মণ, বাঙালি, রাজপুত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগ্রামশীল মানুষের জীবনকথা উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজপুত মহাজন রাসবিহারী সিং, স্বার্থান্বেষী মহাজন নন্দলাল ওঝা এবং সরল বিশ্বাসী মহাজন ধাওতাল সাহু ব্যতীত এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই হতদরিদ্র সহায়সম্বলহীন। চাষাবাদ, পশুপালন, শিকার, কয়লা বিক্রি, কাটুনি মজুরসহ নানাবিধ শ্রমভিত্তিক পেশার সাথে যুক্ত থেকে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। নিরন্তর পরিশ্রম ও সংগ্রামশীলতাই এদের জীবনের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি। জীবন-

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবিকার তাগিদ, অস্তিত্ব-রক্ষার লড়াই ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে সবাই সদাব্যস্ত থাকলেও উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই স্বমহিমায় ভাস্বর, জীবন-যাপন ও জীবন-বিশ্বাসে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। তাদের কেউ বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ, নিঃস্ব হয়ে গেলেও লেখাপড়ার চর্চা ছাড়ে না, আগ্রহ দেখায় না শ্রমজীবনে; কেউ শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত, চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও টোলে পড়ানোর পৈতৃক পেশা ছেড়ে শ্রমজীবী কোনো পেশায় প্রবেশ করবে না; কেউ প্রকৃতিপ্রেমিক, বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির শোভাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বীজ জঙ্গলে পুঁতে রাখে; কেউ সরল বিশ্বাসী মহাজন, টাকা ধার দিয়ে তা উসুলের জন্য কাউকে তাগিদ দেয় না; কেউ সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা, সর্বস্ব হারিয়ে শিকার ও গোচারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে; কেউ মহাজন, কেউ মুহুরি, কেউ সিপাহি, কেউ দরিদ্র স্কুলমাস্টার, কেউ চিকিৎসক, কেউ কবি-দার্শনিক, কেউ নৃত্যশিল্পী, জাতিতে গাঙ্গোতা, দোষাদ, রাজপুত, বাঙালি, মৈথিল ব্রাহ্মণ কিংবা ছত্রী—এমন বিচিত্র শ্রেণি ও পেশার হলেও এদের সকলেই বিশ্বাস করে বিভিন্ন আরণ্যলোকাচারে। বিশ্বাস করে বন্য মহিষের জাগ্রত দেবতা 'টাঁড়বারো' কিংবা 'ডামাবাণু' নামের নির্জন জঙ্গলে থাকা জিন-পরিদের। জীবন-যাপন পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মাচরণ, উৎসব-পার্বণ ও আচার-বিশ্বাসে *আরণ্যকে*র মানুষের জীবনাচারে রয়েছে গভীর সাযুজ্য—যা এ উপন্যাসে প্রতিফলিত ব্রাত্যজীবনের পরিচয় বহন করে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> এই আরণ্য রাজসভার সভাসদ্‌গুলি নামে ও কার্যে, ব্যবহারে ও হৃদয়বৃত্তিতে প্রতিবেশের সহিত এক সুরে বাঁধা—উদার, অনাসক্ত নিস্পৃহতার ভাবমণ্ডলবেষ্টিত। কবি বেঙ্কটেশ্বর, অধ্যাপক মটুকনাথ, উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্, সৌন্দর্যপিয়াসী যুগলপ্রসাদ, সাঁওতাল-রাজা দোবরু পান্না ও তাহার প্রপৌত্রী, নিজ সরল পবিত্র হৃদয়ের খাঁটি আভিজাত্যে গৌরবময়ী তরুণী ভানুমতী, স্বভাবশিল্পী, নৃত্যবিশারদ ধাতুরিয়া—সকলের উপরেই আরণ্য মহিমার রাজচ্ছত্র প্রসারিত। [...] এমন কি বাঙালী ডাক্তার রাখালবাবুর বিধাবা স্ত্রী, বিহার-প্রবাসী দরিদ্র বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ধ্রুবা, জবা—ইহারাও বাঙালী সমাজের বহুশতাব্দীর সাধনালব্ধ সংস্কার হারাইয়া এই অরণ্যসমাজের আভিজাত্যগৌরবহীন, শ্রমকর্কশ জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়াছে। (শ্রীকুমার, ১৯৯৬ : ৬১৪-৬১৫)

আরণ্যক উপন্যাসে বিধৃত এ স্বতন্ত্রস্বভাবী আরণ্যপ্রকৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট মানুষের জীবনাচার স্বাভাবিকভাবেই গভীর বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিকর্ম *আরণ্যক* নিয়ে যাঁরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, গবেষণা ও সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রুশতী সেন, গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, কিশলয় ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, রণজিৎ কুমার সমাদ্দার, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, গিয়াস শামীম, গৌতম কুমার দাস প্রমুখ সমালোচক ও গবেষকের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁদের মধ্যে রুশতী সেন, গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, কিশলয় ঠাকুর ও চিত্তরঞ্জন ঘোষ বিভূতিভূষণের জীবন ও সাহিত্যকর্মের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে *আরণ্যক* উপন্যাসে বিধৃত বিবিধ বিষয় নিয়ে সাধারণ আলোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে, গবেষক রণজিৎ কুমার সমাদ্দার *আরণ্যক*-এ উঠে আসা সাঁওতাল যুদ্ধ-প্রসঙ্গের সাথে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সাহিত্যকর্মে বিধৃত সাঁওতাল গণযুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন; গবেষক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় *আরণ্যক*-এর ভাষার বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করেছেন; গবেষক গিয়াস শামীম আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে *আরণ্যক*-এর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং গবেষক গৌতম কুমার দাস *আরণ্যক*-এর গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ জনপদের ভাষা চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, স্বয়ং ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *আরণ্যক* বিষয়ে যে 'শৌর্য্যপূর্ণ গতিশীল ব্রাত্যজীবনে'র কথা উল্লেখ করেছেন, সে প্রসঙ্গে আরও অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। তারই প্রয়াস চালানো হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

দুই

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র-আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, সেই *পথের পাঁচালী*'র পুরো পথই প্রকৃতি-পরিবেষ্টিত এবং প্রকৃতি-সংলগ্ন মানুষের জীবনাখ্যানের সারাৎসার। *অপরাজিত* (১৯৩২) ও *দৃষ্টিপ্রদীপ* (১৯৩৫) উপন্যাসেও বাংলার চিরচেনা প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য এবং প্রকৃতি-সংলগ্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবজীবনের সাহজিক সারল্যের এক অপূর্ব মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে। তাঁর *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাসও কেবল আরণ্যপ্রকৃতির বর্ণনা নয়, অরণ্যসংশ্লিষ্ট মানুষের জীবন-সংগ্রামের এক অসামান্য রূপায়ণ। এ উপন্যাসের পট-পরিসর গড়ে উঠেছে বাংলা অঞ্চলের বাইরের, তথা বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দিগন্তপ্রসারিত আরণ্যপ্রকৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট জনপদের মানুষকে কেন্দ্র করে। তাদের জীবন-সংগ্রামকে ঔপন্যাসিক তাঁর কল্পনার রঙে রাঙিয়ে উপস্থাপন করলেও *আরণ্যক* সর্বাংশে ঔপন্যাসিকের কল্পলোক উৎসারিত নয়। বিভূতিভূষণ তাঁর পরিদৃশ্যমান বাস্তবজগৎ থেকে আহরণ করেছেন *আরণ্যকে*র আখ্যানভাগ। এ-সম্পর্কে স্বয়ং ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন :

> মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে, যেখানে পতিতপক্ক জম্বুফলের গন্ধে গোদাবরী-তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, 'আরণ্যক' সেই কল্পনালোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—উপন্যাস। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ২)[২]

বস্তুত, ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের 'অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার' হিসেবে যোগ দিয়ে ভাগলপুর যান বিভূতিভূষণ। তবে তাঁর কাজ ভাগলপুরে ছিল না। তাঁকে যেতে হয় আরও প্রায় পনেরো ক্রোশ দূরে, 'উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষেণপুর, পুবে ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহার আর পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমান্ত পর্যন্ত' বিস্তৃত জঙ্গল মহালের 'জঙ্গল আবাদ, জমির বিলি বন্দোবস্ত, তহসিলের তহবিল ঠিক রাখা, মাইলের পর মাইল ঘোড়ার পিঠে ঘুরে ঘুরে মহালে তদারকি' করাসহ বিবিধ কাজ নিয়ে। এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ-জীবনীকার কিশলয় ঠাকুর লিখেছেন :

> ইংরাজি উনিশ শ' চব্বিশের জানুয়ারির শেষে, শীত-সন্ধ্যায় ভাগলপুরে এসে নামলেন বিভূতিভূষণ জঙ্গল মহালের কাজ নিয়ে। প্রথমে এসে উঠলেন ভাগলপুর শহরে রমানাথ ঘোষের সদর কাছারি 'বড়বাসা'য়। শহরের একপ্রান্তে মোগসর পল্লী, সেখানকার বুড়ানাথ রোডের উপর জঙ্গল মহালের সদর কাছারি দোতলা পাকাবাড়ি এই 'বড়বাসা'। [...] তবে [...] তাঁকে যেতে হবে নগরী ছাড়িয়ে প্রায় পনের ক্রোশ দূর থেকে যে জঙ্গল মহাল শুরু হয়েছে, সেইখানে। বুড়ানাথ রোডের দোতলা পাকাবাড়ি নয়, সেখানে জঙ্গলের অভ্যন্তরে খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়ালের কাছারিতে থাকতে হবে। উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষেণপুর, পুবে ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহার আর পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমান্ত পর্যন্ত এই জঙ্গল মহাল। দিক্-দিশেহারা অরণ্য-প্রান্তর, দূর-বিসর্পী শৈলশ্রেণী, জনাই ক্ষেত, মকাই ক্ষেত, চিনাঘাসের দানাভোজী সাঁওতাল আর নানা দেহাতী মানুষ। সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে। (কিশলয়, ১৯৫৮ : ৯৯)

'সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে'র সেই জঙ্গল মহালের কর্ম-অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন তাঁর এই অমর সৃষ্টি *আরণ্যক*। ১৯২৯-এ 'খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনসটিটিউশন'-এ 'বাঙলা শিক্ষক' হিসেবে যোগদানের (কিশলয়, ১৯৫৮ : ১১৫) পূর্বপর্যন্ত প্রায় চার বছর বিভূতিভূষণ জঙ্গলমহালের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত

জঙ্গলমহালের সেই কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতারই শিল্পরূপ *আরণ্যক*। তবে *আরণ্যক* ১৯২৮/১৯২৯-এর তাৎক্ষণিক রচনা নয়, জঙ্গলমহালের কর্মজীবন শেষ হওয়ার প্রায় এক দশক পরে এ স্মৃতিকথাধর্মী উপন্যাস লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ। *আরণ্যক* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯-এ। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে *মাসিক প্রবাসী* পত্রিকায় কার্তিক ১৩৪৪ সংখ্যা থেকে ফাল্গুন ১৩৪৫ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে *আরণ্যক* প্রকাশ হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করে—'কাত্যায়নী বুক স্টল, ২০৩, বিধান সরণী, কলিকাতা [...] চৈত্র ১৩৪৫, ইং ১৯৩৯' (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৪৭৮)। দীর্ঘ সময় বিরতি দিয়ে *আরণ্যক* লিখলেও জঙ্গলমহাল অবলম্বনে একটি উপন্যাস রচনার আকাঙ্ক্ষা বিভূতিভূষণের মনে ১৯২৮ থেকেই সক্রিয় ছিল। এ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর দিনলিপি *স্মৃতির রেখায়* ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ তারিখে লিখেছেন :

> এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটি কঠিন শৌর্য্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন নির্জ্জনতা ঘোড়ায় চড়া পথ হারানো—অন্ধকার—এই নির্জ্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জ্জনতা ভেদ ক'রে সে সুড়ি-পথটা ভিটেটোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐরকম সুঁড়ি-পথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ক'রে ঘোরা, এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি—এইসব। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৪১৭)

নির্জন অরণ্যের কোলে লালিত 'এই জঙ্গল জীবনে'র 'দারিদ্র্য, সরলতা'পূর্ণ যে 'ব্রাত্য জীবনের ছবি' চিত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা ঔপন্যাসিক ব্যক্ত করেছিলেন, তার এক অত্যাশ্চার্য শিল্পভাষ্য *আরণ্যক*। আভিধানিক অর্থে 'ব্রাত্য' বলতে 'পতিত; সংস্কারহীন; ব্রতভ্রষ্ট' (এনামুল হক, ২০১১ : ৯১৩) তথা 'শাস্ত্রসম্মত আচারের বদলে লৌকিক আচার পালনকারী' (মুরশিদ, ২০১৪ : ২১৯৩) জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। 'ব্রাত্য' সম্পর্কে সমালোচক বিমল চক্রবর্তী লিখেছেন—"যারা ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্মের বাইরে ছিলেন বহুদিন বা এখনও রয়ে গেছেন। [...] বহুর মধ্যে যারা ঐক্য উপলব্ধি করতে পারেনি, বিচিত্রের মধ্যে যারা ঐক্যস্থাপন করতে পারেনি তারাই ব্রাত্য" (বিমল, ২০১২ : ১১৯)। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মানুষের বিচিত্র যে জীবনাচার, সে জীবনাচারের সাথে যারা ঐক্যস্থাপন করতে পারেনি, জীবনযাপন-বৈশিষ্ট্যে যারা মূলধারার জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তারাই ব্রাত্য। 'ব্রাত্য' জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে গবেষক অশ্বিনী কুমার দাস লিখেছেন :

> আর্যসমাজে যে দলের মর্যাদা কম ছিল সেই দলকেই প্রথমে 'ব্রাত্য' বলা হত। পরে গায়ত্রহীন ব্রাহ্মণদেরই শুধু বলা হয়েছে 'ব্রাত্য'। আরো পরে সাবিত্রীপতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা আর্যসংস্কৃতিচ্যুত হয়ে 'ব্রাত্য' নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। এই ব্যাপক অর্থে আর্যসংস্কৃতি থেকে শুধু চ্যুত নয়, যাদের সঙ্গে আর্যসংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই, সেইসব বর্ণ বা জাতিকেও 'ব্রাত্য' বলা চলে। (অশ্বিনী, ২০০৯ : ৯)

বস্তুত, আমাদের চেনা-পরিচিত সামাজিক-ধর্মীয়-অর্থনৈতিক-পারিবারিক জীবন-পরিসরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোকায়ত জীবনাচারে অভ্যস্ত, তথাকথিত 'সভ্য' সমাজের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত জীবনচর্চাকারী জনগোষ্ঠীকেই 'ব্রাত্য' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। *আরণ্যক* উপন্যাসে ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দুর্গম অরণ্যের আশ্রয়ে লালিত এমন এক জনজীবনের আখ্যান রূপায়িত হয়েছে, যে জীবন-পরিসর বাঙালির চেনা-পরিচিত সামাজিক জীবন-পরিসর থেকে একেবারেই আলাদা, যা 'ব্রাত্য' জীবনেরই এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় :

> এ উপন্যাসে বাঙলা দেশ নেই, তার সামাজিক, পারিবারিক কোন পরিচিত পরিবেশের চিহ্নমাত্র এখানে চোখে পড়ে না। দিক্‌দিগন্তব্যাপী নির্জন অরণ্য-সমাবৃত এ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত রহস্য-

> নিবিড় যাযাবর জীবন-পরিবেশ। বাঙলা দেশ থেকে মাত্র কয়েক শ' মাইল দূরে রহস্যময় অপরিচিত জগৎ আছে—যেখানে আজও সেই অতিপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক আদিম পৃথিবী ও জীবন-পরিবেশ বেঁচে রয়েছে,—এই আশ্চর্য উপলব্ধি বিভূতিভূষণের আগে আর কেউ আমাদের কাছে বহন ক'রে আনেননি। (গোপিকানাথ, ১৯৫৯ : ১১৩)

আরণ্যকে বিধৃত চরিত্রসমূহের কলকাতা শহর সম্পর্কে অজ্ঞতা উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে লক্ষ করা যায়। যেমন : গনু মাহাতো কলকাতা শহর দেখেনি, ভাগলপুরে একবার গিয়ে গাড়ি দেখে অবাক হয়েছে, ঘোড়া ছাড়া গাড়ি চলতে দেখা তার কাছে তাজ্জব মনে হয়; কবি-দার্শনিক রাজু পাঁড়ের বিশ্বাস 'শহর বড় খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডা', 'সেখানে গেলে কারও জাত থাকে না, সব লোক সেখানকার বদ্‌মাইস', ডাক্তারসাহেব টাকা কম দেয়ায় রোগীর পা কেটে ফেলে প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণা; সাঁওতাল রাজকুমারী ভানুমতী জীবনে কখনও কোনো শহর দেখেনি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত আমাদের চেনা-পরিচিত সমাজ থেকে আলাদা এক সমাজকেই নির্দেশ করে। *আরণ্যক* উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে যে জীবনের চালচিত্র শিল্পরূপ দেয়া হয়েছে, সে জীবন যে বাস্তবিকপক্ষেই ব্রাত্য জীবনের বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত, সে-সম্পর্কে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণের জবানিতে স্বয়ং ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন :

> এইসব যাযাবর গৃহস্থজীবন বড় বিচিত্র। কথা বলিয়া দেখিয়াছি ইহাদের সঙ্গে, সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত, ব্রাত্য ইহাদের জীবন—সমাজ নাই, সংসার নাই, ভিটার মায়া নাই। নীল আকাশের নীচে সংসার রচনা করিয়া, বনে শৈলশ্রেণীর মধ্যস্থ উপত্যকায়, বড় নদীর নির্জ্জন চরে ইহাদের বাস। আজ এখানে, কাল সেখানে। ইহাদের প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যু সবই আমার কাছে নূতন ও অদ্ভুত। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৭১-৭২)

বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে ব্রাত্য তথা অন্ত্যজ জীবনের শিল্পভাষ্য লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদে*ও ব্রাত্য তথা সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের পরিচয় মেলে। বেশির ভাগ চর্যাগানেই ডোম-ডোমনী, শবর-শবরী, নিষাদ, কাপালিক প্রভৃতি ব্রাত্য শ্রেণির মানুষের কথা বলা হয়েছে। ডোম, নিষাদ, শবর এরা গ্রামের বাইরে উঁচু জায়গায় বাস করে, ব্রাহ্মণরা এদের স্পর্শও করে না। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর বড়ু চণ্ডীদাসসহ অন্যান্য কবিগণ, মঙ্গলকাব্যের কবিগণ, *মৈমনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মেও প্রান্ত্যজ মানুষের প্রতি গভীর দরদ লক্ষ করা যায়। আধুনিক যুগের বিভিন্ন সাহিত্যিকের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটকেও ব্রাত্য তথা অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জীবনাচারের নানাবিধ চালচিত্র ভাষারূপ লাভ করেছে। মানবিক জীবনবোধ-উৎসারিত লেখকরা গভীর মমত্ববোধ ও প্রগাঢ় ভালোবাসায় আমাদের তথাকথিত সভ্যসমাজের চারপাশে অবস্থান-করা স্বতন্ত্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, রূপকথা-উপকথা, জীবন-সংগ্রাম, আচার-বিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, সংস্কার-সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, জীবন-জীবিকা, দারিদ্র্য-যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, হতাশা-বেদনা, সংকীর্ণতা-ঔদার্য, প্রেম-বিরহ তথা সামগ্রিক জীবনানুষঙ্গকে শিল্পরূপ দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মে। উল্লেখ্য যে, উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাস যেকোনও জীবনাখ্যান অনুপুঙ্খভাবে উপস্থাপনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। বাঙালি ঔপন্যাসিকরা বিভিন্ন ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর জীবনেতিহাস রূপদানে তাঁদের সেই সুযোগকে যে হাতছাড়া করেননি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *আরণ্যকে* (১৯৩৯) বিধৃত ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের দুর্গম অরণ্যের কোলে লালিত ব্রাত্য জীবনকথা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়* (১৯৪৬) রাঢ়-অঞ্চলের কোপাই নদী-তীরবর্তী বাঁশবাদি গ্রামের কাহার সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র, *নাগিনী কন্যার কাহিনী*তে (১৯৫২) রাঢ়-অঞ্চলের হিজল বিলের বিষবেদে সম্প্রদায়ের উপকথা-নিয়ন্ত্রিত জীবনকথা এবং সাঁওতাল জীবন ও ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে লেখা *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬) উপন্যাসে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা,

সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬০) *ঢোঁড়াই চরিতমানস* (১৯৫১) উপন্যাসে বিহারের জিরানিয়ার অন্তর্গত তাৎমাটুলি-ধাঙড়টুলি-বিসকান্ধা অঞ্চলের অন্ত্যজ ধাঙড় ও তাৎমা সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য, অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) উপন্যাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস-তীরবর্তী অঞ্চলের দরিদ্র ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন-সংগ্রাম; সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) *গঙ্গা* (১৯৪৭) উপন্যাসে গঙ্গা-তীরবর্তী মাছমারা সম্প্রদায়ের জীবনযুদ্ধ এবং রিজিয়া রহমানের (১৯৩৯-২০১৯) *একাল চিরকাল* (১৯৮৪) উপন্যাসে উত্তর বাংলার দিনাজপুর অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনকাহিনি ও জীবন-পরিণামের আখ্যানবৃত্তে উপস্থাপিত বিভিন্ন অঞ্চলের ব্রাত্য জীবনচিত্র তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এসব উপন্যাসে প্রতিফলিত স্বতন্ত্র-স্বভাবী ব্রাত্য জীবনের শৈল্পিক সৌন্দর্য খুব সহজেই পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে।

তিন

আরণ্যকে অরণ্য-প্রকৃতির অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণনা ও ব্রাত্যজীবনের নানারূপ চালচিত্রের পরিচয় মেলে কেন্দ্রীয়-চরিত্র সত্যচরণের জবানিতে। সে *আরণ্যক* আখ্যানের কথক। সত্যচরণ স্বয়ং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনের প্রতিনিধি-চরিত্র। বিভূতিভূষণ ঠিক যেভাবে তাঁর ব্যক্তিজীবনে চাকরিসূত্রে বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গলমহালে গিয়েছিলেন, সত্যচরণও অনুরূপভাবেই ভাগলপুরের ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের অরণ্যে গমন করে। কথক সত্যচরণের উত্তম পুরুষের জবানিতে তার জীবনে ঘটে-যাওয়া অরণ্য-জীবনের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে উপন্যাস-আখ্যান শুরু হয়। একদা ভাগলপুরের ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহারের জঙ্গলমহলে ছয় বছরের যে কর্মজীবন সম্পন্ন করেছে সত্যচরণ, পনেরো-ষোলো বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও সে সেই স্মৃতি ভুলতে পারে না। সেই জঙ্গলমহালের স্মৃতি প্রতিমুহূর্তে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় নির্জন অরণ্যের নিসর্গ সৌন্দর্যের কথা এবং সেই অরণ্যের বিস্তীর্ণ জঙ্গলে পরিচিত হওয়া অগণিত মানুষের জীবন-যাপনের কথা। অরণ্যে লালিত সে-সব মানুষের জীবন আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের জীবন-যাপনের প্রকৃতি-পদ্ধতি থেকে একেবারেই আলাদা। *আরণ্যকে* সেই 'ব্রাত্য জীবনের কথা' জানানোই সত্যচরণের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সত্যচরণের ভাষায় :

> কত অতিদরিদ্র বালকবালিকা, নরনারী কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। [...] ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপন মনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি [...]। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৩)

উপন্যাসের 'প্রথম পরিচ্ছেদ'-এ দেখা যায়, সত্যচরণ বিএ পাস করে বেকার অবস্থায় চাকরি খুঁজছে কলকাতার এক মেসে থেকে। কিন্তু অনেক ঘুরেও কোনও চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে না। এদিকে মেসের ম্যানেজারও পাওনা টাকা পাওয়ার জন্য অস্থির করে তুলছে। এমন এক পরিস্থিতিতে একদিন সতীশ নামে এক পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয় সত্যচরণের। সতীশ তাকে নিয়ে যায় আর এক বন্ধু অবিনাশের গানের জলসায়, যে ময়মনসিংহের কোনও এক জমিদারের ছেলে। পরদিন বন্ধু অবিনাশের বাড়িতে গেলে কথায় কথায় অবিনাশ সত্যচরণকে তাদের জঙ্গলমহালে চাকরির প্রস্তাব দেয়।

> অবিনাশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল—তোমার মত একজন উপযুক্ত লোকের চাকুরী পেতে দেরী হবে না অবিশ্যি। [...] আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি

> বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে? (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৭)

অনেকটা সত্যচরণের মতোই কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের 'অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার' হিসেবে যোগ দেয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন বিভূতিভূষণও :

> সিদ্ধেশ্বরবাবুও কিছুদিন ধরে ভাবছিলেন একটা কথা। সুপারিনটেনডেনট সারদাকান্ত চক্রবর্তীর চিঠিগুলি ইদানীং তাঁকে উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছে। ক্রমাগত আয় হ্রাস পাচ্ছে। কোথায় যেন পুকুরচুরি হচ্ছে মহালে। সুপারিনটেনডেনট সারদাবাবু একজন বিশ্বস্ত সহকারী চান। যোগ্য বেতন দিতে সিদ্ধেশ্বরবাবু রাজি। তাই বলে যোগ্য আর সৎ লোক তো চাইলেই জোটে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, যেতে রাজি হবেন কি বিভূতিভূষণ? অতি সাবধানে প্রস্তাবটা করতেই যেন তা লুফে নিলেন তিনি। মাইনে আরও বেশি—পঞ্চাশ টাকা। সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, আপনি আমাদের ভাগলপুর জঙ্গল মহালের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে গেলে আমার একটা মুশকিল আসান হয়। (কিশলয়, ১৯৫৮ : ৯৯)

সত্যচরণ যেখানে কলকাতায় দিনের পর দিন চেষ্টা করেও চাকরি জোটাতে পারছিল না, সেই পরিস্থিতিতে বন্ধু অবিনাশের পক্ষ থেকে চাকরির এমন সুযোগ বিভূতিভূষণের মতো সেও হাতছাড়া করে না। 'ম্যানেজার'-এর চাকরি নিয়ে এক শীতের বিকালে জঙ্গল-মহালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় সত্যচরণ। গরুর গাড়িতে চড়ে সারারাত পনেরো-ষোলো ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে পরদিন বেলা দশটার সময় জঙ্গল-মহালের কাছারিতে পৌঁছায়। কাছারির সিপাহি মুনেশ্বর সিং অতিশয় দরিদ্র লোক। সে সত্যচরণের কাছে একটি 'লোহার কড়া' কিনে দেয়ার আর্জি জানায়। কী হবে লোহার কড়াই দিয়ে জানতে চাইলে মুনেশ্বর সিং বলে :

> একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। আমার একখানাও কড়া নেই। কতদিন থেকে ভাবছি একখানা কড়ার কথা—কিন্তু হুজুর, বড় গরীব, একখানা কড়ার দাম ছ-আনা, অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন করে? তাই হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১১)

মুনেশ্বর সিংয়ের কথা শুনে সত্যচরণ অবাক হয়ে যায়। একটি লোহার কড়াই যে এত গুণের এবং তার জন্য যে এখানে লোক রাত্রে স্বপ্ন দেখে এটা তার কাছে খুব অস্বাভাবিক লাগে। সে শুনেছিল যে, এ অঞ্চলের লোক বড় গরিব। কিন্তু ছ আনা দামের একখানা লোহার কড়াই জুটলে স্বর্গ হাতে পায় এবং তারা যে এতটা গরিব, এই প্রথম সে তা বুঝতে পারে। মুনেশ্বর সিংয়ের এমন দরিদ্রতার কথা ভেবে তার মায়া হয়। কেবল সিপাহি মুনেশ্বর সিং নয়, *আরণ্যকের* অরণ্যঘেরা প্রতিবেশের প্রায় সকল চরিত্রের জীবন-বাস্তবতাই এমন করুণ। দিনে তিনবেলা দূরে থাক, মাসে কিংবা বছরান্তে একবেলা ভাত খেতে পাওয়া এ অঞ্চলের অরণ্যবাসী মানুষের জন্য রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার! কাছারিতে নতুন ম্যানেজার বাবু এসেছে, তার জন্য ভাত রান্না হবে, সেখানে গেলে একটু ভাত পাওয়া যেতে পারে, এমন প্রত্যাশায় বিনা-নিমন্ত্রণে অনেকে কাছারিতে এসে ভিড় করে।

> পাটোয়ারী বলিল—না হুজুর। ওরা খাবার লোভে এসেছে। আপনার আসবার নাম শুনে আজ দু-দিন ধরে কাছারিতে এসে বসে আছে। এদেশের লোকের ওই রকম অভ্যেস। আরও অনেকে বোধ হয় কাল আসবে। [...] হুজুর, এরা বড় গরীব, ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, এই এরা বারোমাস খায়। ভাত খেতে পাওয়াটা এরা ভোজের সমান

> বিবেচনা করে। আপনি আসছেন, ভাত খেতে পাবে এখানে, সেই লোভে সব এসেছে। দেখুন না আরও কত আসে। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৪)

এ অঞ্চলের মানুষের এমন দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন ও আরণ্যপ্রতিবেশ সত্যচরণের কাছে বড় অদ্ভুত লাগে—"যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি" (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৪)। চিরপরিচিত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই আরণ্যপ্রতিবেশের রহস্যময় জীবনধারার সাথে জড়িয়ে সত্যচরণ এই ব্রাত্যজীবনের নানা অনুষঙ্গের সাথে পরিচিত হয়।

গঙ্গা-তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসসূত্রে 'গঙ্গা' নাম থেকে 'গাঙ্গোতা' জাতিগোষ্ঠীর নামকরণ করা হলেও ত্রিশ বছর পূর্বে গঙ্গায় বিলীন হওয়া জমি পুনরায় চর হিসেবে জেগে উঠলে সেই জমিতে পুরাতন প্রজা হিসেবে তাদের কোনো অধিকার মেলে না। সত্যচরণকে 'ম্যানেজার' হিসেবে চাকরি দিয়ে জঙ্গলমহালে পাঠানো হয়েছিল মূলত জঙ্গল-মহালের জমি ইজারা দেওয়ার জন্য। যে জমি ইজারা দেওয়ার জন্য সত্যচরণকে পাঠানো হয়েছিল, সেই জমি ত্রিশ বছর পূর্বে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছিল। নদীগর্ভে দশ বছর বিলীন থাকার পর চর জেগে ধীরে ধীরে অরণ্যে পরিণত হয় সে অঞ্চল। কিন্তু নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার পূর্বে যারা প্রজা হিসেবে ছিল, জমি গঙ্গায় চলে যাওয়ায় অন্যত্র গিয়ে বাস করছিল, সেই পুরাতন প্রজাদের জমিদার পুনরায় জমি দিতে চান না। জমিদাররা মোটা সেলামি ও বর্ধিত হারে খাজনার লোভে নতুন প্রজাদের কাছেই জমি ইজারা দিতে আগ্রহী। ফলে গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অতিদরিদ্র পুরোনো প্রজাদের বঞ্চিত হতে হয়। সত্যচরণের ভাষায় :

> এই জমি আজ ত্রিশ বছর পূর্ব্বে নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া গিয়াছিল—বিশ বছর হইল বাহির হইয়াছে—কিন্তু যাহারা পিতৃপিতামহের জমি গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে অন্যত্র গিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পুরাতন প্রজাদিগকে জমিদার এই সব জমিতে দখল দিতে চাহিতেছেন না। মোটা সেলামী ও বর্দ্ধিত হারে খাজনার লোভে নূতন প্রজাদের সঙ্গেই বন্দ্যোবস্ত করিতে চান। অথচ যে-সব গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অতিদরিদ্র পুরাতন প্রজাকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহারা বার বার অনুরোধ-উপরোধ কান্নাকাটি করিয়াও জমি পাইতেছে না। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১২-১৩)

জমিদারদের এমন শোষণের শিকার হয় এ অঞ্চলের গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অতিদরিদ্র মানুষেরা। এ অঞ্চলের সকল গাঙ্গোতা-দোষাদ-ছত্রীদের যে নতুন করে জমি ইজারা নেওয়ার সমর্থ ছিল, তা নয়; কিন্তু যাদের সে সমর্থ ছিল, তাদেরও বঞ্চিত হতে হয়েছিল। কেবল জমিদারদের বঞ্চনা নয়, শোষক-মহাজনদের নানারকমের অত্যাচার-শোষণেরও শিকার হতে হয় এ অঞ্চলের গরিব প্রজাদের। কুচক্রী মহাজন নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা এবং ভয়ংকর স্বভাবের মহাজন রাসবিহারী সিংয়ের অত্যাচারে সদা তটস্থ থাকতে হয় এ অঞ্চলের গরিব প্রজাবর্গকে। গরিব প্রজাদের রক্ত চুষেই বড়লোক হয়েছে এরা। কেবল গরিব প্রজা নয়, অপেক্ষাকৃত অবস্থাসম্পন্ন লোকও কিছু বলতে সাহস করে না রাসবিহারী সিংয়ের অত্যাচারের প্রতিবাদে। দুর্দান্ত লাঠিয়াল-বাহিনী দিয়ে মারধর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করাতে সে বিশেষ পটু। তার অস্ত্রাগারে সংরক্ষিত অগুনতি লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙি, তলোয়ারসহ বিবিধ অস্ত্র প্রজাদের শাসনার্থেই ব্যবহার করে সে। কোনো লোক কোনোভাবে তার প্রাপ্য সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে, রাজবিহারী সিংয়ের এমন মনে হলে ওই লোকের আর রক্ষা নেই। নিজের আবাদ-করা জমির ফসল তো নিবেই, অন্যের আবাদ-করা জমির ফসল দখল করতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির মাধ্যমে এ অঞ্চলে 'লাঠি যার, ফসল তার' প্রবাদপ্রতিম অন্যায়-শাসন প্রতিষ্ঠা করে রাসবিহারী সিং। রাজপুত রাসবিহারী সিং, ছটু সিং, গজার সিংকে আবার সাহায্য করে অপর মহাজন নন্দলাল

ওঝা গোলাওয়ালা। খাসমহলের সার্কেল অফিসার, ম্যানেজার, পুলিশ সকলেই রাসবিহারীর হাতে থাকায় কাউকেই গ্রাহ্য করে না সে। সত্যচরণের ভাষায় :

> রাসবিহারী সিং-ই এদেশের রাজা। তাহার কথায় গরীব গৃহস্থ প্রজা থরহরি কাঁপে, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকও কিছু বলতে সাহস করে না, কেননা রাসবিহারীর লাঠিয়াল-দল বিশেষ দুর্দ্দান্ত, মারধর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহারা বিশেষ পটু। পুলিসও নাকি রাজবিহারীর হাতে আছে। খাসমহলের সার্কেল অফিসার বা ম্যানেজার আসিয়া রাসবিহারী সিং-এর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় সে কাহাকে গ্রাহ্য করিবে এ জঙ্গলের মধ্যে? (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৬৬-৬৭)

জমিদার-মহাজনদের শোষণ-বঞ্চনার শিকার এ অঞ্চলের দরিদ্র-জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলকেই বিভিন্ন শ্রমনির্ভর পেশার (যেমন- চাষাবাদ, পশুপালন, শিকার, কয়লা বিক্রি, কাটুনি মজুর প্রভৃতি) মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। চাষাবাদ বলতে এ অঞ্চলে মকাই, কলাই, গম, ভুট্টা, খেড়ী প্রভৃতির চাষ হয়। ধানের উপযুক্ত নাবাল-জমি নেই বলে এ অঞ্চলে ধান একেবারেই হয় না।

> আমাদের মহালের জমিতে বছরে তিনটি খাদ্যশস্য জন্মায়—ভাদ্র মাসে মকাই, পৌষ মাসে কলাই এবং বৈশাখ মাসে গম। মকাই খুব বেশী হয় না, কারণ ইহার উপযুক্ত জমি বেশী নাই। কলাই ও গম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, কলাই বেশী, গম তাহার অর্দ্ধেক। [...] ধান একেবারেই হয় না—ধানের উপযুক্ত নাবাল-জমি নাই। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৭৭)

পশুপালন এ অঞ্চলের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম পেশা। অবারিত অরণ্য থাকার কারণে অরণ্যে গরু-মহিষ পালন করে অনেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। লবটুলিয়া জঙ্গলের প্রায় বড় একটা অংশ প্রতি বছর গোয়ালাদের গরু-মহিষ চরানোর জন্য খাজনায় দেওয়া হয়। চাষাবাদ-পশুপালন ছাড়াও পশুপাখি শিকার, কয়লা বিক্রি ও কাটুনি মজুর হিসেবে কাজ করে এ অঞ্চলের অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। যখন বিভিন্ন ফসল কাটার সময় আসে তখন কাটুনি মজুররা সেই অঞ্চলের ফসল কাটার জন্য। ফসল কেটে তারা ফসলের একটা অংশ মজুরি হিসেবে পায়। পূর্ণিয়া, তরাই, জয়ন্তীর পাহাড়ি-অঞ্চল ও উত্তর ভাগলপুর থেকে গাঙ্গোতা-ছত্রী-ভূমিহার জনগোষ্ঠীর অনেকেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কাটুনি মজুর হিসেবে কাজ করার জন্য আসে। ফসল কাটা হয়ে গেলে চলে যায়।

> নক্‌ছেদী বলিল—ধান তো এদেশে হয় না—ওখানে হয়। ধান কাটার কাজ শেষ হলে আবার যাব গম কাটতে মুঙ্গের জেলায়। গমের কাজ শেষ হতে জ্যৈষ্ঠ মাস এসে পড়বে। তখন আবার খেড়ী কাটা শুরু হবে আপনাদেরই এখানে। তার পর কিছুদিন ছুটি। শ্রাবণ-ভাদ্রে আবার মকাই ফসলের সময় আসবে। মকাই শেষ হলেই কলাই এবং ধরমপুর-পূর্ণিয়া অঞ্চলে কার্ত্তিকশাল ধান। আমরা সারা বছর এই রকম দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াই। যেখানে যে সময়ে যে ফসল, সেখানে যাই। নইলে খাব কি? ((বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১০২-১০৩)

এছাড়াও যখন কোনও কাজ থাকে না, তখন কেউ কেউ কেবল জীবিকার প্রয়োজনে সামান্য উপার্জনের আশায় নাচের দল তৈরি করে নাচ দেখানোর জন্য এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে ঘুরে তারা 'হো হো নাচ', 'ছক্কর-বাজি নাচ' ও 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ দেখায়। নাচের কিছু জানুক বা না-জানুন কেবল দুমুঠো খাবারের আশায় প্রায় সব ধরনের, সব বয়সের লোককে সে নাচের দলে এসে যুক্ত হতে দেখা যায় (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৪৮)। বস্তুত, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনাতিপাত করে এ অঞ্চলের মানুষেরা। তাই জীবন বাঁচানোর তাগিদটা তাদের কাছে সব থেকে জরুরি। আর জীবন বাঁচানোর জন্যই বিভিন্ন পেশার কাজ করে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যায় এ অঞ্চলের মানুষ।

দারিদ্র্য ও অর্থকষ্টের কারণে উপযুক্ত বয়স পার হয়ে গেলেও বিয়ে করতে পারেনি গনোরী তেওয়ারী। কোনো পিতাই এই চালচুলোহীন দরিদ্র স্কুল মাস্টারকে কন্যা সম্প্রদান করতে চায় না। তাই নিজ গাঁয়ের পছন্দের মেয়েটির সাথে বিয়ে ঠিকঠাক হলেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভেঙে যায় তার। মেয়েটিকে তার মনে ধরেছিল, কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে সংসার করার সৌভাগ্য তার হয়নি।

মাঝে মাঝে নানা রকমের প্রাকৃতির দুর্যোগ ও বন্য প্রাণীর আক্রমণের শিকার হতে হয় এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে। কখনও বাঘের উৎপাত বেড়ে যায়। যেমন : ফুলকিয়া বইহারে একদিন গভীর রাতে ঘুমানোর সময় খুপড়ি থেকে বাঘ এসে একটা শিশুকে ধরে নিয়ে যায়, পরে সত্যচরণসহ অন্যরা গিয়ে সেখানে বাঘের পায়ের থাবাও দেখতে পায়; তার ঠিক তিনদিন পর সন্ধ্যার সময় বনের কাছ থেকে একটা রাখালকে বাঘে নিয়ে যায় ইত্যাদি। কখনও কখনও বন্য মহিষ ও শূকরের উপদ্রব বেড়ে যায়। কখনওবা গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় দাবানল বা জলকষ্টের মতো 'বিভীষিকাময়' প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গ্রীষ্মকালে উত্তরে আজমাবাদ হতে দক্ষিণে কিষণপুর, পূর্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্যন্ত সারা জঙ্গলের সব খাল, ডোবা, কুণ্ডী (বড় জলাশয়) শুকিয়ে গেলে চারদিকে জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। একদিকে জলকষ্ট, অন্যদিকে শুরু হয় দাবানল। গ্রীষ্মকালে বনাঞ্চলে একবার আগুন ধরে গেলে মাইলের পর মাইল দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে মানুষের জীবনকে ভয়াবহ সঙ্কটে ফেলে দেয়। এমনি নানা রকমের প্রাকৃতির দুর্যোগের সাথে নিয়ত লড়াই করেই বাঁচতে হয় *আরণ্যকের* জনগোষ্ঠীকে।

খাবার হিসেবে এ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, খেড়ী বা শ্যামাঘাসের দানা, বাথুয়া শাক, মটরশাক, বন্য গুড়মী ফুল, চীনা ঘাসের বীজ প্রভৃতি সিদ্ধ, ভাজা বা লবণ দিয়ে কাঁচা খেয়েই জীবন নির্বাহ করে। গনু মাহাতোর ভাষায় :

> হুজুর, দোকানে জিনিস কেনবার মত পয়সা কি আমাদের আছে, না আমরা বাঙালী বাবুদের মতো ভাত খেতে পাই? [...] খেড়ীর দানা সিদ্ধ, আর জঙ্গলে বাথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ, আর একটু লুন, এই খাই। ফাগুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, লুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে—লতানে গাছ, ছোট কাঁকুড়ের মত ফল হয়; সে সময় এক মাস এ-অঞ্চলের যত গরীব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ২০)

বস্তুত, অরণ্যভূমি বলে এখানে ধানের উপযুক্ত নাবাল-জমি না-থাকায় ভাত এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ 'কালেভদ্রে' খেতে পারে। ফলে ভাত খাওয়াটা এদের কাছে শখের বা বিলাসিতার মতো একটা ব্যাপার হিসেবে গণ্য। তবে একেবারে সবাই যে ভাত জোটাতে পারে না, তা নয়। "ভাত এ অঞ্চলের মধ্যে কেবল রাসবিহাসী সিং আর নন্দলাল পাঁড়ে [ওঝা] খায় দুবেলা" (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ২০)। উল্লেখ্য যে, ভাতের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হলেও নন্দলাল ওঝা ও রাসবিহারী সিংদের খাবার-ব্যবস্থা ও খাবার পরিবেশনার পদ্ধতি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। মহাজন নন্দলাল ওঝার আমন্ত্রণে তার বাড়িতে গেলে সত্যচরণকে খেতে দেওয়া হয় :

> প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা—সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতীর কানে মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া। খাবারের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ কখনও দেখি নাই। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ২২)

বৈচিত্র্যপূর্ণ ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজনের দেখা মেলে মহাজন রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতেও :

> ভোজ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া কিন্তু তাক্ লাগিল। এত কি একজনে খাইতে পারে? হাতীর কানের মত বৃহদাকার পুরী খান-পনের, খুরিতে নানা রকম তরকারি, দই, লাড্ডু, মালপো, চাটনি,

> পাঁপর। আমার তো এ চার বেলার খোরাক। রাসবিহারী সিং নাকি একা এর দ্বিগুণ আহার্য্য উদরস্থ করিয়া থাকে একবারে। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৬৯)

জঙ্গল-মহালের ম্যানেজার সত্যচরণের জন্য প্রাচুর্যপূর্ণ খাবারের আয়োজন করলেও একই অনুষ্ঠানে আসা সাধারণ গাঙ্গোতা প্রজাদের জন্য মহাজন রাসবিহারী সিং ব্যবস্থা করে চীনা ঘাসের ভাজা দানা ও দই। তাও কোনো খাবার পরিবেশনের পাত্রে নয়, উঠানে পাতা বিছিয়ে তাতেই সরবরাহ করা হয় সে খাবার। দরিদ্র প্রজারা সেই দই ও চীনা ঘাসের ভাজাই মুখে হাসি নিয়ে খায়। খাদ্যসঙ্কট *আরণ্যক* উপন্যাসে বিধৃত সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিত্যদিনের সমস্যা। কেবল খাবারের বন্দোবস্ত না-করতে পারার কারণে ম্যানেজার সত্যচরণের পাতের উচ্ছিষ্ট নিয়ে ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর প্রত্যাশায় অসহায় বিধবা নারী কুন্তা প্রতিদিন এসে অপেক্ষা করে থাকে।

নানা রকমের লোকবিশ্বাসে *আরণ্যকের* জীবন স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। অরণ্যে জীবনযাপন করতে গিয়ে তারা প্রায় সকলেই বন্য মহিষের দেবতা 'টাঁড়বারো'কে বিশ্বাস করে। তাদের ধারণা, বনের মধ্যে চলতে গিয়ে যখন কোনো বন্য মহিষের দল বিপদে পড়ে, তখন বন্য মহিষের দেবতা টাঁড়বারো এসে আসন্ন বিপদ থেকে মহিষগুলোকে রক্ষা করে। ছুটু সিং তার দলবল নিয়ে বন্য মহিষ শিকারের জন্য একবার মহিষের চলাচলের পথে বড় গর্ত খুঁড়ে রাখে। তাদের পরিকল্পনা ছিল, বন্য মহিষ এসে যখন সেই গর্তে পড়বে, অমনি তারা আড়াল থেকে বেড়িয়ে গর্তে পড়া মহিষটি শিকার করবে। কিন্তু মহিষের দল গর্তের কাছাকাছি এসে পড়লে রহস্যজনকভাবে টাঁড়বারো এসে মহিষের দলের সামনে হাত উঁচু করে দাঁড়ায় এবং মহিষের দল অন্য দিকে চলে যায়। এভাবে মহিষের দেবতা টাঁড়বারো আসন্ন বিপদের হাত থেকে বন্য মহিষের দলকে রক্ষা করে। দশরথ ঝাণ্ডাওলার ভাষায় :

> গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এগিয়ে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্ত্তের ধারে, গর্ত্তের দশহাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে-মূর্ত্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতেও এল না একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৯৮)

টাঁড়বারোর গল্প কেবল দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালার বানানো আখ্যান নয়, এ অঞ্চলের মানুষের লোকবিশ্বাসের অংশ। গনু মাহাতোও একবার সত্যচরণকে টাঁড়বারোর অভিজ্ঞতা জানিয়েছিল। লবটুলিয়ার পাটোয়ারীও ছোটবেলা থেকে অনেকবার টাঁড়বারোর গল্প শুনেছে। এমনকি সাঁওতাল-রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দ্দীও টাঁড়বারোতে বিশ্বাস করে :

> রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্ব্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন—কত লোক দেখেছে। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১২২)

টাঁড়বারোর মতোই মায়াবিনী বনদেবী বা জিন-পরিতে বিশ্বাস করে *আরণ্যকের* অরণ্যে লালিত লোকজন। তাদের ধারণা, গভীর জ্যোৎস্নারাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন দলবেঁধে সরস্বতী কুণ্ডীর (জলাশয়) জলে 'হুরী-পরীরা' নেমে আসে স্নান করতে। তারা কাপড় খুলে ডাঙায় পাথরের উপর রেখে জলে স্নান করতে নামে। কখনওবা জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্ম-ফুলের মতো জেগে আছে। তবে সে-সময় কেউ

পরিদের দেখে ফেললে পরীরা তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। আমীন রঘুবর প্রসাদ পরিদের হাতে মৃত্যুবরণকারী হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং-এর মৃত্যুর বর্ণনা দেন এভাবে :

> [...] হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তারপর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে-তাঁবুতে—পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তাঁর একটা কান খেয়ে ফেলেছিল। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৮৩)

মায়াবিনী বনদেবীরা কখনও কখনও নির্জন অরণ্যে খুপরি করে থাকা মানুষের খুপরিতে গভীর রাতে বিভিন্ন রূপ ধরে আসতো। কখনও আসতো 'সাদা কুকুর' কখনওবা 'সাদা ধোয়া শাড়ী' পরিহিত কম বয়সী মেয়ের রূপ ধরে। এমনকি প্রায় একই সময়ে রামচন্দ্র আমীন 'সাদা কুকুর' হিসেবে দেখলেও আসরফি টিণ্ডেল 'মেয়ে' মানুষের রূপে দেখতে পায়। রামচন্দ্র আমীনের সাথে কথোপকথনের বিষয়টি এভাবে সত্যচরণকে জানায় আসরফি টিণ্ডেল :

> উনি বললেন—কুকুরটা দেখলে? আমি বললাম—কুকুর কই বাবু, একটা কে মেয়ে তো বার হয়ে গেল। উনি বললেন—উল্লুক, আমার সঙ্গে বেদায়বি? মেয়েমানুষ কে আসবে এই জঙ্গলে দুপুর রাতে? আমি কুকুরটার লেজ চেপে ধরেছিলাম, এমন কি তার লম্বা কান আমার গায়ে ঠেকেছে। মাচার নীচে ঢুকে কেঁউ কেঁউ করছিল। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৫০-৫১)

মেয়ে মানুষের রূপ ধরে চলে যাওয়ার পরে আসরফি টিণ্ডেল পিছু পিছু গিয়ে পায়ের ছাপ দেখার চেষ্টা করেও কোনও পায়ের ছাপ দেখতে পায় না। আবার কখনও খুঁজতে গিয়ে একগাছা কালো কুচকুচে নরম চুল খুঁজে পায়। এমন সব রহস্যময় ঘটনার পরে এক রকম উন্মাদ হয়ে যায় রামচন্দ্র আমীন। বোমাইবুরুর জঙ্গলে দেখতে পাওয়া এই রহস্যময়ী জিন-পরিদের স্থানীয়ভাবে 'ডামাবাণু' বলে। 'মেয়ে' রূপ ধরে আসা জিন-পরি দেখতে পায় বোমাইবুরুর জঙ্গলে জমি ইজারা নিয়ে গরু-মহিষ চরাতে আসা বৃদ্ধ এবং তার যুবক ছেলেও। বৃদ্ধ প্রথমে ভেবেছিল তার যুবক ছেলে হয়তো বিগড়ে যাচ্ছে কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়ে। বৃদ্ধ ছেলেকে নিয়ে কাছারিতে এসে সত্যচরণের কাছে ছেলের নামে বিচারও দিয়েছিল। কিন্তু অলৌকিকভাবে সেই জিন-পরির হাতেই [?] জীবন চলে যায় সেই যুবক ছেলের। সত্যচরণের ভাষায় :

> গিয়া দেখি তাহারা যে ঘরটাকে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ-জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ তখনও পড়িয়া আছে। মুখে তাহার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন—কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া যেন মারা গিয়াছে। [...] মনে হয়, সে হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া কোন-কিছুর অনুসরণ করিয়া বনের মধ্যে ঢোকে—কারণ, মৃতদেহের কাছেই একটা মোটা লাঠি ও লণ্ঠন পড়িয়া ছিল, কিসের অনুসরণ করিয়া সে বনের মধ্যে রাত্রে একা আসিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কারণ, নরম বালিমাটির উপরে ছেলেটির পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনও পায়ের দাগ নাই—না মানুষ, না জানোয়ারের। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৫৪-৫৫)

এমনি বিচিত্র অলৌকিক বিশ্বাস, লোক-সংস্কার, লৌকিক মিথ ও অতি-প্রাকৃত ঘটনা, 'উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথরের গল্প, 'আঁতুড়ে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা' প্রভৃতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ *আরণ্যকের* ব্রাত্যজীবন।

আরণ্যকের ব্রাত্যজীবনকে বিশিষ্টতা দিয়েছে এ অঞ্চলের মানুষের পালন-করা বিভিন্ন লোকউৎসব। পুণ্যাহ, 'ছট্-পরবে'র উৎসব, হোলির উৎসব, ঝুলন পূর্ণিমার উৎসব, কড়ারী তিনটাঙার হোলির মেলা, ফসল কাটারি মেলাসহ বিভিন্ন রকমের মেলা হয় এখানে। সাধারণত জমিদারি প্রথায় বছরের সূচনায় প্রজার নিকট থেকে খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে পুণ্যাহ অনুষ্ঠান করা হলেও এ অঞ্চলে পুণ্যাহ অনুষ্ঠান হয় 'আষাঢ় মাসে'। জঙ্গল-মহালের ম্যানেজার সত্যচরণ কাছারিতে পুণ্যাহের আয়োজন করে। আষাঢ় মাসের বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনেক দূরের পথ

পাড়ি দিয়ে দরিদ্র গাঙ্গোতা-দোষাদ জনসাধারণ সামান্য খাবারের প্রত্যাশায় কাছারিতে উপস্থিত হয়। পুণ্যাহ'র দিনে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় 'চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু'। অতি সাধারণ সে খাবার খেতেই কাছারিতে মানুষের উপ্‌চে পড়া ভীড় :

> দুপুর হইতে-না-হইতে দলে দলে লোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে ধারাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কাছারিতে পৌঁছিলে লাগিল, এমন মুশকিল যে, তাহাদের বসিবার জায়গা দিতে পারা যায় না। দলের মধ্যে অনেক মেয়ে ছেলেপুলে লইয়া খাইতে আসিয়াছে, কাছারির দপ্তরখানায় তাহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিলাম, পুরুষেরা যে যেখানে পারে আশ্রয় লইল। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৩২)

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ঝুলন পূর্ণিমার উৎসব মূলত শ্রীকৃষ্ণের অনুসারীদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। শ্রাবণ মাসে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না এ উৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে সাঁওতাল রাজ-পরিবারের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বহুদিনের চর্চা। এ অনুষ্ঠানকে ঘিরে যুবক-যুবতীরা অনেক আনন্দ করে। ঝুলনের দিন সন্ধ্যার পূর্বে একদল তরুণ-তরুণীসহ সকলে একটা প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করে পাহাড়ের দিকে যায়। পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে আবার কিছুটা পথ উঠে একটা সমতল স্থানে মিলিত হয়। সেখানে একটা প্রাচীন পিয়াল গাছের নিচে 'প্রায় ত্রিশটি কিশোর তরুণী' গাছটিকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। একদল যুবক সেই তরুণীদের সঙ্গে মাদল বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুরতে থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত নৃত্য-গান আনন্দ করে বাড়ি ফিরে যায় তারা। সত্যিই বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সে আয়োজন :

> সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একদল তরুণ-তরুণী পাহাড়ের দিকে রওনা হইল—তাহাদের পিছু পিছু আমরাও গেলাম—সে এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা। [...] কিছুদূর উঠিতে একটা সমতল স্থান পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা প্রাচীন পিয়াল গাছ—গাছের গুঁড়ি ফুল ও লতায় জড়ানো। রাজা দোবরু বলিলেন—এই গাছ অনেক কালের পুরোনো—আমি ছেলেবেলা থেকে দেখ আসছি এই গাছের তলায় ঝুলনের সময় মেয়েরা নাচে। [...] আমরা একপাশে তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম, আর এই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনান্তস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল—পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া একদল যুবক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ভানুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৪১)

হোলির উৎসব এ অঞ্চলের মানুষের, বিশেষ করে রাজপুতদের একটি প্রধান উৎসব। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে রাজপুত মহাজন রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতে হোলির উৎসব আয়োজিত হয়। রাসবিহারী সিংয়ের বহু গাঙ্গোতা ও রাতপুত প্রজা সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। দরিদ্র প্রজা, যাদের পক্ষে ভালো কাপড় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তারা মলিন ছেঁড়া কাপড় পরেই 'আবীর ও রঙ' মাখানো ও হোলি খেলতে চলে আসে। হোলির জন্য সত্যচরণের সামনে কিছু আবীর, কিছু ফুল, কয়েকটি টাকা, গোটাকতক চিনির এলাচদানা, মিছরিখণ্ড, এক ছড়া ফুলের মালাসহ একটা বড় থালা এগিয়ে দেয়া হয়। রাসবিহারী সিং সত্যচরণের কপালে কিছু আবির মাখিয়ে দিলে সত্যচরণও রাসবিহারী সিংয়ের কপালো কিছু আবির মাখিয়ে দেয়। রাজপুতদের হোলি উৎসব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সত্যচরণ তার সামনে এগিয়ে দেওয়া থালায় রাখা টাকা দেখে বুঝতে পারে না যে, তার কী করা উচিত! তখন রাসবিহারী সিং জানায়, থালায় দেওয়া টাকা মূলত সত্যচরণকে নজরানা হিসেবে দেয়া হয়েছে। সত্যচরণ তখন নিজের পকেট থেকে আরও কিছু টাকা বের করে থালায় রাখা টাকার সাথে মিশিয়ে সবাইকে সেই টাকা দিয়ে মিষ্টিমুখ করাতে বলে (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৬৮)। হোলির উৎসবে আরও নানা রকমের নাচ-

গানেরও ব্যবস্থা করা হয়। নাটুয়া শিল্পী ধাতুরিয়াকে চার আনা পয়সা মজুরি দিয়ে আনা হয় অর্ধেক রাত পর্যন্ত নাচ ও গানের জন্য।

এ অঞ্চলের আরও একটি বিশেষত্বপূর্ণ উৎসব 'ছট্-পরবে'র উৎসব। সাধারণত হিন্দু বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী কার্তিক মাসের ষষ্ঠ তিথিকে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন টোলা (পাড়া/পল্লি) হতে মেয়েরা হলুদ-ছোপানো শাড়ি পরে দলে দলে গান গাইতে গাইতে কল্‌বলিয়া নদীতে 'ছট্' ভাসাতে যায়। সারাদিন টোলাজুড়ে নানা-রকম উৎসব চলতে থাকে। সন্ধ্যায় প্রায় সব বাড়িতেই বিভিন্ন রকমের পিঠা বানানো হয়। ছট্-পরবের উৎসবে টোলার সকল লোক বিশেষ ধরনের পোশাক 'ফর্সা ধুতি' ও 'মেরজাই'[৩] পরিধান করে। এ উৎসবে সারারাত চলে এ-বাড়ি ও-বাড়ি খাওয়া-দাওয়া আর নাচগান, হাসি ও বাজনার ধুম।

> কার্ত্তিক মাসে ছট্-পরব এদেশের বড় উৎসব। বিভিন্ন টোলা হইতে মেয়েরা হলুদ-ছোপানো শাড়ী পরিয়া দলে দলে গান করিতে করিতে কলবলিয়া নদীতে ছট্ ভাসাইতে চলিয়াছে। সারাদিন উৎসবের ধুম। সন্ধ্যায় বস্তিগুলির কাছ দিয়া যাইতে যাইতে ছট্-পরবের পিঠে ভাজার ভরপুর গন্ধ পাওয়া যায়। কত রাত পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের হাসি কলরব, মেয়েদের গান— [...] কলহাস্যমুখরিত, গীতিরবপূর্ণ উৎসবদীপ্ত এক বিস্তীর্ণ জনপদ। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৭৯)

'মেলা' এ অঞ্চলের উৎসব-অনুষ্ঠানের একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। এখানে নানা উপলক্ষ্যে সময়ে সময়ে মেলা বসে; যেমন– কড়ারী তিনটাঙার মেলা, অখিলকুচার মেলা কিংবা ফসল কাটার সময় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ফসল কাটারি মেলা প্রভৃতি। তবে এসব মেলার মধ্যে সবথেকে বিশেষত্বপূর্ণ মেলা হচ্ছে কড়ারী তিনটাঙার হোলির মেলা। বেশ বড় পরিসরে গ্রামের মাঠে এ মেলা হয়। মেলায় দূরের ও কাছের বিভিন্ন স্থান থেকে, যেমন– মহিষারডি, কড়ারী, তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, ভীমদাসটোলা, মহালিখারূপ প্রভৃতি স্থান থেকে লোকজন আসে। তরুণীরা চুলে পিয়াল ফুল ও রাঙা ধাতুপফুল গুঁজে কিংবা মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুনি আটকিয়ে সেজেগুঁজে মেলায় আসে, আড্ডা দেয়, বিভিন্ন কিছু যেমন- পুঁতির দানার মালা, সাবানের বাক্স, বাঁশি, আয়না প্রভৃতি ক্রয় করে। ছেলে মেয়েরা মেলা থেকে তিলুয়া, রেউড়ি, রামদানার লাড্ডু ও তেলে-ভাজা খাজা কিনে খায়। মেলায় বইয়ের একটি দোকানে চটের থলের ওপর হিন্দী *গোলেবকাউলী*, *লায়লা-মজনু*, *বেতাল পঁচিশী*, *প্রেমসাগর* প্রভৃতি নানা রকমের বই নিয়ে বসলেও তেমন কেউ বই কেনে না। মেলার পাশে এক জায়গায় লোকজন দলবেঁধে রান্না করে খায়, যাদের জন্য আবার মেলার এক অংশে বিভিন্ন তরিতরকারির বাজার বসে, যেখানে কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় শুঁটকী কুচো চিংড়ী ও নাল্‌সে পিঁপড়ের ডিম, কাঁচা পেঁপে, শুকনো কুল, কেঁদ-ফুল, পেয়ারা ও বুনো শিম বিক্রয় হয়। উল্লেখ্য যে, "লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য" (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৪১)। এছাড়াও বিভিন্ন রকমের ফসল যখন কাটা হয়, মানুষের কাছে যখন ফসল কিংবা টাকা থাকে, তখন ফসল কাটাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ফসল কাটারি মেলা হয় এ অঞ্চলে। কখনও কখনও অসাধু কিছু মানুষ নানারকমের লটারি, লাঠি খেলার নামে বিভিন্ন জুয়াখেলার আয়োজন করে সরল ছেলেমেয়েদের অর্থ হাতিয়ে নেয়। এমনি এক জুয়াখেলায় দুই ভাই এক বোনের অর্থ নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা উঠে এসেছে এভাবে :

> [...] কোথায় নাকি লাঠি ও দড়ির ফাঁসের জুয়াখেলা হইতেছিল, বড় ছেলেটি সেখানে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে। একটা লাঠির যে-দিকটা মাটিতে ঠেকিয়া আছে সেই প্রান্তটা দড়ি দিয়া জড়াইয়া দিতে হয়, যদি দড়ি খুলিতে খুলিতে লাঠির আগায় ফাঁস জড়াইয়া যায়, তবে খেলাওয়ালা খেলুড়েকে এক পয়সায় চার পয়সা হিসাবে দেয়। বড় ভাইয়ের কাছে ছিল দশ আনা পয়সা, সে একবারও লাঠিতে ফাঁস বাধাইতে পারে নাই, সব পয়সা হারিয়া ছোট ভাইয়ের আট আনা ও পরিশেষে ছোট বোনের চার আনা পয়সা পর্য্যন্ত লইয়া বাজি ধরিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে! (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৪৬)

আরণ্যক উপন্যাসে ঔপন্যাসিক লোকায়ত প্রেমের কয়েকটি উপাখ্যান তুলে ধরেছেন, যা থেকে দুর্গম অরণ্যভূমির সরল মানুষদের হৃদয়ভাবনার সাথে পরিচিত হওয়া যায়। ভূঁইহার বামুন জয়পাল কুমারের নিঃসঙ্গতা যে কোনও পাঠকের মনকেই ভাবিয়ে তোলে। পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা। স্ত্রী-কন্যা সবই তার ছিল। কিন্তু স্ত্রী-কন্যাকে হারিয়ে এখন সে এই বনে এসে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে; এখানে একা থাকে, কারো সঙ্গে কথা বলে না, কোথাও যায়ও না, কিছু করেও না। জীবন সম্পর্কে সে এতোটা নিস্পৃহ হয়ে গেছে যে, এখন আর কিছুই খারাপ লাগে না তার। যেন ব্যক্তি বিভূতিভূষণের নিঃসঙ্গতা ধারণ করে এ অরণ্যে বসবাস করছে জয়পাল কুমার।

রাজু পাঁড়ের যৌবনে প্রেম হয়েছিল তার স্ত্রী সরযুর সাথে। রাজুর বয়স যখন আঠারো ও সরযুর বয়স চৌদ্দ বছর, তখন উত্তর-ধরমপুরের শ্যামলালটোলাতে সরযুর বাবার টোলে রাজু দিনকতক ব্যাকরণ পড়তে যায়। সে-সময়ই সরযুর প্রেমে পড়ে যায় রাজু। ছট্ পরবের উৎসবের দিন সরযুর সাথে রাজুর প্রেমালাপ, সরযুর বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব এবং তার পর বিয়ে—বায়ান্ন বছর বয়সী রাজু পাঁড়ের মুখে বর্ণিত সেই প্রেমাখ্যানের স্মৃতিচারণ সত্যিই চমৎকার। রাজু পাঁড়ের প্রেমস্মৃতি :

> আমি বললাম—সরযু, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, তোমার সঙ্গে দেখাশোনাও বন্ধ, আমার লেখাপড়া হবে না জানি, কেন মিছে কষ্ট পাই, ভাবছি টোল ছেড়ে চলে যাব এ মাসের শেষেই। সরযু কেঁদে ফেললে। বললে—বাবাকে বলো না কেন? সরযুর কান্না দেখে আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। এমনি হয়ত যে কথা কখনও আমার অধ্যাপককে বলতে পারতাম না, তাই বলে ফেললাম একদিন। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১২৬)

কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ তার প্রিয়তমা স্ত্রী রুক্মাকে নিয়ে বেশ সুখেই সংসার করছে। কিন্তু কবিতার মাধ্যমে সে একটি গ্রাম্য প্রেম-কাহিনি শোনায় সত্যচরণকে। ছোট্ট একটি খালের এ-পারের মাঠে এক তরুণ যুবক বসে ভুট্টার ক্ষেত পাহারা দিত এবং খালের ওপারের ঘাটে একটি মেয়ে নিত্য কলসি-কাঁখে জল ভরতে আসতো। মেয়েটি আসলে ছেলেটার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শিস দিয়ে গান করা, ছাগল গরু তাড়ানো, মাঝে-মধ্যে চোখাচোখি হলে মেয়েটির লজ্জায় লাল হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়া প্রভৃতি প্রেমের সুখস্মৃতি এখনও যুবকটি ভুলতে পারে না। একসময় মেয়েটি হারিয়ে গেলেও যুবকের মধ্যে সেই প্রেমস্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করে। কবিতার মাধ্যমে বর্ণিত এ গ্রাম্য প্রেমের গল্প যে কবি বেঙ্কটেশ্বরের নিজের শৈশব জীবনের গল্প, যে প্রেমের স্মৃতি বহু বছর পরেও কবিকে তাড়িত করছে, সত্যচরণ সহজেই তা বুঝতে পারে। সত্যচরণের ভাষায় :

> কবি-প্রিয়ার নাম রুক্মা, কারণ ঐ নামে কবি একটি কবিতা লিখিয়াছে, পূর্ব্বে আমাকে তাহা শুনাইয়াছিল। ভাবিলাম এমন গুণবতী, সুরূপা রুক্মাকে পাইয়াও কি কবির বাল্যের সে দুঃখ আজও দূর হয় নাই। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৩৪)

বলিষ্ঠ প্রেমের উজ্জ্বল বর্তিকা *আরণ্যক* উপন্যাসের দেবী সিং রাজপুতের বিধবা স্ত্রী কুন্তা। এক সময়ের মহাজন দেবী সিং বাবুগিরি ও অযথা অর্থ ব্যয় করে এবং নিজের জাতভাই রাসবিহারী সিংয়ের সাথে মোকদ্দমা করে নিঃস্ব হয়ে মৃত্যুবরণ করলে কুন্তার জীবনের নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভোগ। অনেক কষ্ট, দুঃখ-দৈন্য, হেনস্থা, অপমান স্বীকার করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বহু কষ্টে দিনাতিপাত করলেও রাসবিহারী সিংয়ের কুপ্রস্তাবে আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দেয় না সে। তার বলিষ্ঠ উচ্চারণ- "মেরে ফেল বাবুজী, জান দেগা—ধরম দেগা নেহিন।" কুন্তার মতো চরিত্রের বলিষ্ঠতা, উদারতা, সরলতা ও প্রাণবন্ততায় *আরণ্যকের* নারী চরিত্রসমূহ পুরুষ চরিত্রগুলোকে অনেকাংশেই ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রাণোচ্ছলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নক্ছেদী ভকতের দ্বিতীয় স্ত্রী মঞ্চী, সারল্য-উদারতার প্রতীক রাজকন্যা ভানুমতী এবং মানবিকতা-আতিথেয়তার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় কবি বেঙ্কটেশ্বরের স্ত্রী রুক্মা। এ-প্রসঙ্গে সত্যচরণের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :

> আরও দেখিয়াছি, এ-দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা—ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক। এমনি পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে ও বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে—এদের ভালোবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালোবাসাও বড়। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৩৯)

আরণ্যকে সাক্ষাৎ মেলে বেশ কিছু স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যতিক্রমী চরিত্রের। প্রকৃতিপ্রেমিক যুগলপ্রসাদ এদের মধ্যে অন্যতম। তার শখ বা নেশা হচ্ছে অরণ্যের মধ্যে নানারকমের ফুলগাছ লাগানো, বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ফুলগাছের বীজ মাটিতে পুঁতে রাখা। 'অদ্ভুত মেজাজের' ও 'এক রকম খামখেয়ালী' স্বভাবের যুগলপ্রসাদ শিক্ষিত একজন লোক। কিন্তু কোনো কাজ করে না সে। বিয়ে-সাদি করেছে, অথচ সংসার দেখে না। বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির শোভাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলগাছের বীজ সংগ্রহ করে অরণ্যের মাটিতে পুঁতে রাখে। কেবল প্রকৃতিপ্রেমিক নয়, সে একজন উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদও। ফুলের বর্ণনা শুনেই সে বিচিত্র প্রকৃতির অপরিচিত ফুলগাছের নাম বলে দিতে পারে। ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কিংবা বনে-ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাবে, এটাই তার শখ। এসব করে অদ্ভুত প্রশান্তি ও আনন্দ পায় যুগলপ্রসাদ :

> অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম এক সাহেবের বাগানে ভারি চমৎকার বিলিতি লতা—বেশ রাঙা রাঙা ফুল! তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতাফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝাড় বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে। [...] আমি এর আগেও এ কাজ করেছি হুজুর, লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন, ও-সব আমি দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে গিয়েছে। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৮৪)

মৈথিল ব্রাহ্মণ মটুকনাথ পাঁড়ে *আরণ্যকের* অপর একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত চরিত্র। সে অত্যন্ত দরিদ্র। সত্যচরণ চাষবাস করার জন্য কিছু জমি দিতে চাইলেও সে চাষবাস করতে চায় না। সে কিছু সংস্কৃত পড়েছে, কিন্তু তেমন কোনও কাজ শেখেনি – একটা টোলে কিছুদিন পড়ানো ছাড়া কোনও কাজ করেনি সে। বংশানুক্রমে তারা শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তাই একটি টোল খুলে পড়াতে চায় সে। অগত্যা সত্যচরণ তাকে টোলের জন্য একটি ঘর বেঁধে দিলে সেখানে মটুকনাথ টোল প্রতিষ্ঠা করে। কোনও ছাত্র না-পেলেও সে আশা ছাড়ে না, সেখানে একা একা মুগ্ধবোধের সূত্রগুলো আবৃত্তি করে, পূজার সময় নিজে প্রতিমা গড়ে পূজা করে। অনেকদিন পরে একজন ছাত্র পেয়েও সে খুব খুশি হয়। জঙ্গল থেকে বাথুয়া শাক তুলে তা সিদ্ধ করে একবেলা খেয়ে, কখনও না-খেয়েও সে তার টোল চালিয়ে নিতে থাকে। কোনও পরিস্থিতিতেই নিজের পৈতৃক শাস্ত্র-ব্যবসায় ত্যাগ করে না।

নওগছিয়া গ্রামের সরল মহাজন ধাওতাল সাহু সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একটি চরিত্র। নওগছিয়া গ্রামের প্রজা, জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার প্রায় সকলেই ধাওতাল সাহুর খাতক। সে মহাজন নন্দলাল ওঝা ও রাসবিহারী সিংয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের মানুষ। তার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, সুদে টাকা ধার দিয়ে সে কখনও টাকা তোলার জন্য জোর করে তাগাদা দিতে পারে না। ফলে বহুজন তাকে ফাঁকি দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তার কাছে এসে টাকা চাইলে সে না করতে পারে না। সরলভাবে সবাইকে সে বিশ্বাস করে। তাকে আর টাকা না-দেওয়ার জন্য বললে সে জানায় :

> সবাই ফাঁকি দেয় না হুজুর। এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে, মাথার উপর দীন-দুনিয়ার মালিক এখনও আছেন। টাকা কি বসিয়ে রাখলে চলে, সুদে না বাড়লে আমাদের চলে না হুজুর। এই আমাদের ব্যবসা। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৩৪)

আরণ্যকের জঙ্গলে লালিত নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া একজন স্বভাবশিল্পী। নাচ শেখার প্রতি অদম্য আগ্রহ রয়েছে তার। একজন 'যথার্থ শিল্পীর দরদ ও সাধনা আছে' তার মধ্যে। কেবল নাচের প্রতি আকুল আগ্রহের কারণেই 'ছক্করবাজি নাচ' শেখার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে সে গয়া জেলার তিনটাঙা গ্রামে ছক্করবাজি নাচের মস্ত ওস্তাদ ভিটলদাসের কাছে যায়। কিন্তু *আরণ্যক* অঞ্চলের অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে ধাতুরিয়া তার নৃত্যের যথাযোগ্য সমাদর পায় না। তাই সে সত্যচরণের কাছে কলকাতা যাওয়ার আগ্রহের কথা জানায় কেবল তার নাচের সমাদর পাওয়ার জন্য :

> কখনও কলকাতায় যাই নি, শুনেছি সেখানে গাওনা বাজনা নাচের বড় আদর। ভাল ভাল নাচ শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখবার লোক নেই, তাতে বড় দুঃখ হয়। ছক্করবাজি নাচটা না নেচে ভুলেই যেতে বসেছি। উঃ, কি করেই ওই নাচটা শিখি! (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৭১)

রাজু পাঁড়ে চরিত্রটি তার জীবনাচারের জন্য সহজেই *আরণ্যক* পাঠকের নজর কাড়ে। গরিব ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়েকে সত্যচরণ একরকম বিনামূল্যে দুই বিঘা জমি চাষাবাদ করে খাওয়ার জন্য দেয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে দেড় বছরের মধ্যে দুই-বিঘে জমির জঙ্গলই পরিষ্কার করতে পারে না। হিন্দি ও সংস্কৃত জানা রাজু পাঁড়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে পূজা-অর্চনা, পুঁথি-বইপত্র পাঠ, কবিতা লেখা ও আকাশ-পাহাড় দেখা নিয়ে। পূজাপাঠ ও গীতাপাঠেই চলে যায় তার দিনের বড় একটা সময়, জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করার মতো অবসর সময়ই পায় না সে। ধরমপুর পরগণার বাড়িতে তার তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও বিধবা বোন থাকার পরেও সংসারের চেয়ে প্রকৃতি-ঈশ্বরভক্তি-কবিতা-দর্শনের প্রতিই তার আগ্রহ। কবি-দার্শনিক-সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ রাজু পাঁড়ের কিছুটা দখল রয়েছে চিকিৎসাবিদ্যায়ও। শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হলে মানবিক মানুষ রাজু সেখানে গিয়ে মানুষের চিকিৎসাসেবা প্রদান করে। রাজু পাঁড়ের দার্শনিক মন সর্বদা জটিল তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করে এবং জটিলতা সমাধান করে নিজের মনগড়া যুক্তি দিয়ে। আকাশে রামধনু ওঠে উইয়ের ঢিবি থেকে, এমনটা নাকি সে স্বচক্ষে দেখেছে; নক্ষত্রদল হচ্ছে যমের চর, মানুষ কি পরিমাণে বাড়ছে তা সরেজমিনে তদারক করার জন্য নক্ষত্রদল প্রেরিত হয়; সূর্য পূর্বে উদয়-পাহাড়ে ওঠে, যা তার গুরুভাই কামতাপ্রসাদ স্বচক্ষে দেখেছে প্রভৃতি। হিন্দি লেখাপড়া কিছুটা জানলেও বহির্জগৎ সম্পর্কে রাজু পাঁড়ের জ্ঞান নেই। 'কলিকাতা' নামটা সে শুনেছে, কিন্তু ঠিক কোন দিকে তা জানে না। বোম্বাই বা দিল্লির বিষয়ে তার ধারণা 'চন্দ্রলোকের ধারণা'র মতো 'সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কুয়াসাচ্ছন্ন'। অনেক বছর পূর্বে একবার পূর্ণিয়া শহরে গিয়ে থাকলেও শহর সম্পর্কে তার রয়েছে অদ্ভুত ধারণা। তার ধারণা, শহর খুব খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডার স্থান; শহরের অধিকাংশ মানুষ বদ্‌মাইস, সেখানে গেলে মানুষের জাত থাকে না; শহরের হাসপাতালে ডাক্তাররা টাকার জন্য মানুষের চিকিৎসার পরিবর্তে ক্ষতিসাধন করেন। তার ভাষায় :

> রাজু বলিল—শহর বড় খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডা শুনেছি। সেখানে গেলে শুনেছি যে জাত থাকে না। সব লোক সেখানকার বদ্‌মাইস। আমার এ-দেশের একজন লোক কোন্ শহরের হাসপাতালে গিয়েছিল, তার পায়ে কি হয়েছিল সেই জন্যে। ডাক্তার ছুরি দিয়ে পা কাটে আর বলে, তুমি আমাকে কত টাকা দেবে? বললে দশ টাকা দেব। তখন ডাক্তার আরও কাটে! আবার বললে—এখনও বল কত টাকা দেবে? সে বললে—আরও পাঁচ টাকা দেব, ডাক্তারসাহেব আর কেটো না। ডাক্তার বললে—ওতে হবে না—বলে আবার কাটতে লাগল।

> সে গরীব লোক, যত কাঁদে, ডাক্তার ততই ছুরি দিয়ে কাটে—কাটতে কাটতে গোটা পা-খানাই কেটে ফেললে। উঃ, কি কাণ্ড ভাবুন তো হুজুর! (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১২৪)

সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশের সব থেকে বড় 'আদিবাসী' বা 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ। ১৮৫৫ সালের[৪] (১২৬২ বঙ্গাব্দ) 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা ও বিহারের ভাগলপুর অঞ্চল থেকে। সেই ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দ্দী। এ অঞ্চলের আদিম ও পাহাড়ি জাতিরা এখনও তাকে রাজা মানে। সত্যচরণ রাজা দোবরুর সাথে গিয়ে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের সমাধিস্থল ও দুর্গ-প্রাসাদ পরিদর্শন করে ভারতবর্ষের অতীত-ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শনের সাথে পরিচিত হয়। তবে বর্তমানে রাজা দোবরু পান্নার রাজ্য বা প্রতাপ কোনোটাই নেই। অতিশয় দরিদ্র অবস্থায় গরু চরিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাঁকে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা, প্রাচীন অভিজাত-বংশীয় বীর রাজা দোবরু পান্না গরু চরাচ্ছেন শুনে সত্যচরণ প্রথমে অবাক হয়েছিলেন। তাঁর সাথে কথা বলে জানতে পারলেন, রাজা দোবরু ছিলেন সূর্যবংশের রাজা। এই পাহাড়-জঙ্গলে তাঁদের রাজত্ব ছিল। যৌবনে তিনি কোম্পানির সঙ্গে লড়েছেন। বর্তমানে সব হারিয়ে নিঃস্ব।

> বলিলাম—আপনারা এ-দেশের প্রাচীন রাজবংশ, আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে। দোবরু পান্না বলিলেন—এখন আর কি আছে? আমাদের বংশ ছিল সূর্য্যবংশ। এই পাহাড়-জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তার পর আর কিছু নেই। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১১৭)

বিভিন্ন রকেমের বৈচিত্র্যপূর্ণ নিজস্ব রীতি-নীতি আচার-বিশ্বাস লালন করে এ অঞ্চলের ব্রাত্য জনগোষ্ঠী, যেগুলো সাধারণত কোনো বাঙালি সমাজে দেখা যায় না।

> এদেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ীর মানুষ দেখিয়া কাঁদে নাই—অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে, স্বামীগৃহে বড় সুখেই আছে—মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়ই লজ্জার কথা। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ৪১)

হাতি পোষা এ অঞ্চলে আভিজাত্যের চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হয়। মহাজন নন্দলাল ওঝা তার বাড়িতে সত্যচরণকে নেওয়ার জন্য হাতি পাঠিয়েছিল। রাসবিহারী সিংয়ের গোয়ালে প্রায় ষাট-পয়ষট্টিটি গরু, আস্তাবলে সাত আটটি ঘোড়া আছে, কিন্তু কোনো হাতি নাই। তাই সে হাতি ক্রয় করতে চায়, কারণ– এ অঞ্চলে হাতি না-থাকলে সে সম্ভ্রান্ত লোক হিসেবে বিবেচিত হয় না। এছাড়াও বড়লোকদের বাড়িতে কোনো অতিথি এলে দুই বার বন্দুক দিয়ে গুলির আওয়াজ করে অভ্যর্থনা জানানো এ অঞ্চলের রীতি। সত্যচরণ মহাজন নন্দলাল ওঝা ও রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতে গেলে উভয় স্থানেই তাকে বন্দুকের আওয়াজ দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হয়।

ধর্ম-পরিচয়ে এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্মের তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে এরা মহাবলী হনুমানকে বেছে নিয়েছে তাদের ধর্মাচরণে। রাম-সীতা, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা এখানে খুবই কম হয়। সত্যচরণের ভাষায় :

> ধর্ম্মের কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। ইহারা যদিও হিন্দু, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ইহারা হনুমানজীকে কি করিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে জানি না—প্রত্যেক বস্তীতে একটা উঁচু হনুমানজীর ধ্বজা থাকিবেই—এই ধ্বজার রীতিমত পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা

> হয়। রাম-সীতার কথা ক্বচিৎ শোনা যায়, তাঁহাদের সেবকের গৌরব তাঁহাদের দেবত্বকে একটু বেশী আড়ালে ফেলিয়াছে। বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজার প্রচার তত নাই—আদৌ আছে কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ আমাদের মহালে তো আমি দেখি নাই। (বিভূতিভূষণ, ১৩৬৩ : ১৭৭-১৭৮)

ধর্ম-পালনে দেবতাকে নিয়ে উঁচু-নিচুজাতের মধ্যে বিরোধও এখানে লক্ষ করা যায়। যেমন : নিচুজাতের মানুষ দ্রোণ মাহাতো শিবভক্ত হিসেবে একটি শিলাখণ্ড নিয়ে শিবের পূজা করলে তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না ব্রাহ্মণ মটুকনাথ পাঁড়ে। ব্রাহ্মণ মটুকনাথের বক্তব্য হচ্ছে, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করলে পূজা পাওয়ার যোগ্যই হয়ে ওঠে না। উঁচু-নিচু, জাতি-বর্ণের বিভেদ লক্ষ করা যায় পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা দোষাদদের প্রতি ব্রাহ্মণ, ছত্রী ও গাঙ্গোতাদের মনোভাবে। যদি দোষাদ শ্রেণিভুক্ত মেয়েদের বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ঘরে তোলা হয়, তাহলে ঘরের সব খাবার ফেলে দিতে হবে, সেই খাবার ব্রাহ্মণ-ছত্রী-গাঙ্গোতা কেউ খাবে না। বাঈজির মেয়ে কুন্তাকে বিয়ে করার জন্যই দেবী সিং ও কুন্তাকে সমাজচ্যুত করা হয়, যা কৌলীন্য প্রথারই নিদর্শন। মঞ্চীকে কুণ্ডীর জলে স্নান করতে না-দেওয়ার মধ্যে জাতপাতের বৈষম্যই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চার

আরণ্যক উপন্যাস সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। আরণ্যপ্রকৃতির জীবন্ত বর্ণনা ও অরণ্যের কোলে লালিত ব্রাত্য জীবনের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় এক অসামান্য সাহিত্যকর্ম *আরণ্যক*। আমাদের চেনা-পরিচিত জগৎ থেকে বহুদূরের অরণ্যে জীবন-যাপন করা এ মানুষগুলো আরণ্যপ্রকৃতির মতো সরল, উদার ও প্রাণোচ্ছল। সরল সিপাহি মুনেশ্বর সিং অবলীলায় তার স্বপ্ন 'একটি লোহার কড়া'র কথা জানায় সত্যচরণকে, যদিও তখনও সে জানে না নতুন ম্যানেজার সত্যচরণ কেমন স্বভাবের মানুষ। সরল বিশ্বাসী ও মানবদরদি মহাজন ধাওতাল সাহু ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাবে কি পাবে না তার দিয়ে মনোযোগ না-দিয়ে বিপদে পড়ে ধার নিতে আসা মানুষের প্রয়োজনটাকেই সে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে টাকা ধার দেয়। মানুষের প্রয়োজনটাই তার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে, কতোটা সুদ পাওয়া যাবে সেটা নয়। অনেক অভাবে দিনাতিপাত করে একবেলা খেয়ে অথবা না-খেয়েও টোলে পড়ানোর কাজ চালিয়ে যায় পণ্ডিত মটুকনাথ পাঁড়ে। যদিও অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা-গ্রহণের পরিবর্তে খাওয়া-থাকার লোভেই তার টোলে এসে ভর্তি হয়, তবুও সে শিক্ষাদানের বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়ে অপার আগ্রহ নিয়ে টোল পরিচালনা করে। গভীর অরণ্যে সারাদিন একা একা থাকা সত্ত্বেও দেড় বছরে মাত্র দুই বিঘা জমির জঙ্গল সাফ করার সময় হয়ে ওঠে না কবি-দার্শনিক-চিকিৎসক রাজু পাঁড়ের। মন তার প্রকৃতির মতো স্বচ্ছ। আপন মনে পূজার্চনা, গীতাপাঠ ও আকাশ-পাহাড়ের সৌন্দর্য অবলোকন করেই দিন কেটে যায় তার। এদের জীবনবিশ্বাসের তুলনা কেবল এদের সাথেই করা চলে। সরল মঞ্চীকে সূরয-কুণ্ডীর জলেস্নান করতে নামতে দেওয়া হয়নি বলে সে কেঁদে ফেলে। তার যুক্তি, এ তো পাহাড়ি ঝরনা, যে-সে এখানে নাইতে পারে। কোনও রকমের ভেদবুদ্ধির ধারণা ছিল না বলেই এমন সরল, অথচ লক্ষ্যভেদী যুক্তি উপস্থাপন করা সম্ভব হয় তার পক্ষে। দেবী সিংয়ের বিধবা স্ত্রী বাঈজির মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও শত কষ্ট, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করেও নিজের সম্ভ্রম বিসর্জন দেয় না। সাঁওতাল রাজকন্যা ভানুমতী সামান্য একটি আয়না পেয়েই মহা খুশি হয়। সাঁওতাল রাজকন্যা হয়েও কোনও শহর দেখা হয়নি তার। নগরজীবন সম্পর্কে ধারণা না-থাকার কারণেই নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া ভাবে হয়তো কলকাতা শহরে তার শেখা 'ছক্করবাজি' নাচের অনেক সমাদর মিলবে। এমন জীবনাচার তাদের যাপিত ব্রাত্য জীবনকেই নির্দেশ করে। যে জীবনের উৎসব-পার্বণ, খাদ্যাভ্যাস, অতি-প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি সভ্য সমাজের জীবনাচার থেকে একেবারেই আলাদা।

টীকা

১. গাঙ্গোতা জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে *The Tribes and Castes of Bengal* গ্রন্থে লেখা হয়েছে, "Gangota, Gangauta, a cultivating, landholding, and labouring caste of Behar. Many of them live on the banks of the Ganges, and this is said to be the origin of the name." (Risley, 1891 : 268)

২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)। *বিভূতি-রচনাবলী [পঞ্চম খণ্ড]*। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও অন্যান্য [সম্পা.]। কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ। এ-সংস্করণ থেকে বর্তমান গবেষণায় *আরণ্যক* উপন্যাসের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. 'মেরজাই' হচ্ছে ফতুয়াজাতীয় হাতাকাটা একজাতীয় ছোট জামা বিশেষ।

৪. সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বা ১২৬২ বঙ্গাব্দে। *আরণ্যক* উপন্যাসে সম্ভবত অসাবধানতাবশত সাঁওতাল বিদ্রোহের তারিখ হিসেবে ১৮৫৫ সালের (১২৬২ বঙ্গাব্দের) পরিবর্তে ১৮৬২ সাল উল্লেখ করা হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

অশ্বিনী কুমার দাস (২০০৯)। *স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবন : তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা*। আলীগড় : আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। [পিএইচডি অভিসন্দর্ভ]

আলোক মণ্ডল (২০১৪)। *নানা রঙের বিভূতিভূষণ*। ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, কলকাতা।

কিশলয় ঠাকুর (১৯৫৮)। *পথের কবি*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

গিয়াস শামীম (২০১৫)। *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (সম্পা., ২০১৪)। *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান* (দ্বিতীয় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৫৯)। *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

গৌতম কুমার দাস (২০০৯)। *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস : গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ জনপদের ভাষা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ (১৩৬৬)। *বিভূতিভূষণ*। বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, কলিকাতা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৯৩)। *বিভূতি-রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড)। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও অন্যান্য [সম্পা.]। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।

(১৩৬৩)। *বিভূতি-রচনাবলী* (পঞ্চম খণ্ড)। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও অন্যান্য [সম্পা.]। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।

বিমল চক্রবর্তী (২০১২)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার*। অক্ষর পাবলিকেশনস্, ত্রিপুরা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২)। *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা., ২০১১)। *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রণজিৎ কুমার সমাদ্দার (১৩৬২)। *সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য*। চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০০)। *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রুশতী সেন (১৯৯৫)। *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৬)। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

সরদার আবদুস সাত্তার (২০১০)। *কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে*। সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৭)। *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সুব্রত বড়ুয়া (২০১৬)। *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*। গদ্যপদ্য, ঢাকা।

H. H. Risley (1891). *The Tribes and Castes of Bengal*. The Bengal Secretariat Press, Calcutta.